اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। মার্চ ২০২৫

আল-ইশরাক

বাংলা

সম্পাদক: মাওলানা উমর ফারুক

সম্পাদনা পরিষদ:

মঞ্জুর এলাহী

হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

ইমদাদ হোসেন

Ghamidi Center of Islamic Learning

www.ghamidi.org

An Initiative of Al-Mawrid US

اشراق
Ishraq USA | Bangla Edition
ইশরাক বাংলা সংস্করণ। ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আল-ইশরাক

বাংলা

সূচিপত্র

১) আল-বায়ান: ভূমিকা ৩

২) মিজান [মুকাদ্দিমা ১ : মূলনীতি] ৯

৩) নামাজ না পড়লে প্রহার, ইসলাম কী বলে? ১৪

৪) আদর্শ হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জ্ঞান ও কর্ম
(হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আসার) ২০

৫) ইসলামে জ্ঞান ও যুক্তির মৌলিক নীতিমালা ২৭

৬) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াত ৩০

৭) রোজার উদ্দেশ্য কী? ৩৯

৮) গজল ৪৫

Ghamidi Center of Islamic Learning
www.ghamidi.org
AN INITIATIVE OF AL-MAWRID US.

আল-বায়ান: ভূমিকা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

স্বীয় বিষয়বস্তুর আলোকে কুরআন সম্পর্কে বলা যায় – এটা একজন রাসুলের আপন জাতিকে হুশিয়ার করার উপাখ্যান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে এটা তো জানা বিষয় যে, নবুয়তের পাশাপাশি তিনি রিসালাতের মর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহতায়ালা যেসব ব্যক্তিকে মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন এবং নিজের তরফ থেকে ওহি ও ইলহামের মাধ্যমে যাদেরকে তিনি দিক-নির্দেশনা দান করেন – তারাই নবী। কিন্তু প্রত্যেক নবীর বেলায় এটা আবশ্যক নয় যে, তিনি রাসুল হবেন। রিসালাত বিশেষ এক মর্যাদা, যা অল্প সংখ্যক নবী হাসিল করেছিলেন। কুরআনের বিবরণ মোতাবেক – রাসুল নিজ আহ্বানকৃত জনপদের জন্য খোদা তায়ালার আদালত হয়ে আসেন এবং ঐ আহ্বান শুনতে পাওয়া সকলের বিচার-ফয়সালা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কুরআনে বলা হয়েছে: রাসুলগণের দাওয়াতে [শ্রোতাদের ভাগ্য-নির্ধারণী] এই ফয়সালা ইনযার [হুশিয়ারি], ইনযারে আম [সাধারণ হুশিয়ারি], ইতমামে হুজ্জাত [সত্যকে সুস্পষ্ট করে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা], হিজরত [দেশত্যাগ] ও বারাআত [সম্পর্কচ্ছেদ] – এই ধাপগুলো অতিক্রম করে প্রকাশ পায় এবং ঐ ফয়সালা এমনভাবে প্রকাশ পায় যেন জমিনের বুকে বসেছে আসমানি আদালত। [মনে হবে] খোদায়ি আযাব ও পুরস্কারের ফয়সালা প্রদানের এক আসর এটা; আর ওদিকে রাসুলের ফরমান শুনতে পাওয়াদের ভাগ্যে নেমেছে ছোটখাটো একটি কিয়ামত।

আর ওদিকে রাসুলের ফরমান শুনতে পাওয়াদের ভাগ্যে নেমেছে ছোটখাটো একটি কিয়ামত। এই দাওয়াতের যে ইতিহাস কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, এক্ষেত্রে কেবল দুটো প্রেক্ষাপট সামনে আসতে পারে:

- প্রথমটি হচ্ছে – নবীর সাথিদের সংখ্যা কম এবং তাদের পক্ষে হিজরত করাটাও সম্ভব নয়।
- দ্বিতীয়টি হচ্ছে – নবীর সাথিদের সংখ্যা পর্যাপ্ত এবং তিনি তার সাথিদের নিয়ে হিজরতে বেরিয়ে পড়েন, আর এই হিজরতের পূর্বেই আল্লাহতায়ালা কোনো একটি ভূখণ্ডে তাদের জন্য স্বাধীনভাবে বসবাস এবং সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি চর্চার বন্দোবস্ত করে দেন।

উভয় প্রেক্ষাপটে রাসুলদের সাথে সম্পর্কিত খোদার ঐ সুন্নাত আবশ্যিকভাবে কার্যকর হয়, যা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

“প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে রাসুল। আর যখনই তাদের রাসুল আগমন করে, তখনই ইনসাফের সাথে তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করে দেয়া হয়, আর তাতে কেউ-ই জুলুমের শিকার হয় না।” (সুরা ইউনুস, ১০:৪৭)

প্রথম অবস্থায় রাসুল তার জাতিকে ছেড়ে চলে যান – এটা সাধারণত রাসুলের মৃত্যু বা তার হিজরতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। [রাসুল তার জাতিকে ছেড়ে যাওয়ার পর] এই ফয়সালা এমনভাবে শোনানো হয় যেন আসমান থেকে এক ঝাঁক সেনা নেমেছে। লণ্ডভণ্ডকারী তুফান বয়ে চলে এবং মেঘ ও বাতাসের বাহিনী ঐ জাতির উপর এমন হামলা চালায় যে, রাসুলের বিরোধীতাকারীদের কেউই জমিনে অবশিষ্ট থাকে না। যাদের সাথে এমনটি ঘটে, তাদের জন্য কুরআন ‘মুশরিক’ শব্দটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে যারা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের বেলায় এমনটি ঘটে না। তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, সমূলে বিনাশের পরিবর্তে তাদের উপর অপমান ও গোলামীর শাস্তি চাপিয়ে দেয়া হয়। বনি ইসরাইল জাতির সাথে এমনটিই ঘটেছে, এটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি। অন্যদিকে নুহ, হুদ, সালিহ, লুত, শুআইব নবীদের জাতি এবং এমন অন্যান্য জাতির সাথে এরূপ আচরণ করা হয়নি, বরং তাদেরকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিস্থিতিতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে আযাবের ফয়সালা রাসুল ও তার সাথিদের তরবারির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই পরিস্থিতিতে ঐ জাতি কিছুটা অবকাশ লাভ করে। রাসুল এই সময়ে তার হিজরত করা ভূমিতে সেখানকার শ্রোতাদের উপর ইতমামে হুজ্জাত [তথা সত্যকে সুস্পষ্ট করে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠার কাজটি] পূর্ণ করতে থাকেন, তার উপর ঈমান আনা লোকদের শিক্ষা দিতে থাকেন এবং নৈতিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে চলমান যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ [শক্তি হিসেবে] গড়ে তোলেন। পাশাপাশি হিজরত করা ভূমিতে নিজেদের ক্ষমতাকে এমনভাবে সুসংহত করেন যে, সেখানকার লোকদের সাহায্যে তিনি সত্য অস্বীকারকারী জাতিকে সমূলে বিনাশ করেন এবং সত্যের অনুসারীদের জন্য বিজয় ও সমৃদ্ধির সূচনা ঘটান।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, নবীর পক্ষ থেকে হওয়া ইনযার [হুশিয়ারি], ইনযারে আম [সাধারণ হুশিয়ারি], ইতমামে হুজ্জাত [সত্যকে সুস্পষ্ট করে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা], হিজরত [দেশত্যাগ], বারাআত [সম্পর্কচ্ছেদ] এবং তার শত্রু ও মিত্রদের শাস্তি ও পুরস্কারের দিনলিপি বর্ণনাই কুরআনের বিষয়বস্তু। কুরআনের প্রতিটি সুরা এই প্রেক্ষাপটের আলোকে নাযিল হয়েছে এবং কুরআনের সবগুলো অধ্যায়কে এই সূত্র মোতাবেক বিন্যাস করা হয়েছে।

সংক্ষেপে এ ধরনের বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: কুরআনের প্রতিটি সুরা একে অপরের সাথে জোড়বদ্ধ এবং সুরাগুলোকে সাতটি [বৃহৎ] অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর আলোকে প্রতিটি সুরা নিজের একটি জোড় বা প্রতিলিপি রাখে। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যে ধরনের বন্ধন থাকে, ঐ দুটো সুরার মধ্যে ঠিক তেমন বন্ধন বিদ্যমান। কিছু সুরা এর ব্যতিক্রম, যেমন: সুরা ফাতিহা – যা পুরো কুরআনের একটি ভূমিকা। অবশিষ্ট ব্যতিক্রমী সুরাগুলো হয় সম্পূরক বা উপসংহার, নয়তো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচক। অতঃপর [জোড়বদ্ধ ও কিছু ব্যতিক্রমী] সুরাগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠা সাতটি [বৃহৎ] শ্রেণিতে কুরআনের সুরাগুলোকে সাজানো হয়েছে, যেখানে এই সাতটি [বৃহৎ] শ্রেণিকে আমরা অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করেছি। কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট এই বাস্তবতাকে সুরা হিজরে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔

“(হে নবী) আমরা আপনাকে সাত মাছানি অর্থাৎ মহিমান্বিত কুরআন দিয়েছি।”
(সুরা হিজর, ১৫:৮৭)

আল-বায়ান: ভূমিকা

কুরআনের এই সাত অধ্যায়ের প্রতিটি অধ্যায় এক বা একাধিক মাক্কি সুরা দিয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় এক বা একাধিক মাদানি সুরা দিয়ে।

প্রথম অধ্যায় ফাতিহা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং মায়েদাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই অধ্যায়ে ফাতিহা মাক্কি এবং অবশিষ্ট চারটি সুরা মাদানি।

দ্বিতীয় অধ্যায় দুটো মাক্কি সুরা আনআম ও আরাফ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে দুটো মাদানি সুরা আনফাল ও তওবা দিয়ে।

তৃতীয় অধ্যায় ইউনুস থেকে মুমিনুন পর্যন্ত প্রথম ১৪-টি মাক্কি সুরা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং একটি মাদানি সুরা নুর দিয়ে শেষ হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ফুরকান থেকে শুরু হয়ে আহযাবে গিয়ে শেষ হয়েছে।এর মধ্যে প্রথম ৮-টি সুরা মাক্কি এবং সর্বশেষ একটি সুরা অর্থাৎ আহযাব মাদানি।

পঞ্চম অধ্যায় সাবা থেকে আরম্ভ হয়ে হুজুরাতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।এর মধ্যে ১৩-টি সুরা মাক্কি এবং শেষ দিকের ৩-টি সুরা মাদানি।

ষষ্ঠ অধ্যায় কাফ থেকে শুরু হয়ে তাহরিমে গিয়ে শেষ হয়েছে।এই অধ্যায়ে ৭-টি সুরা মাক্কি এবং অবশিষ্ট ১০-টি সুরা মাদানি।

সপ্তম অধ্যায়ের সূচনা মুলক দিয়ে এবং সমাপ্তি নাস দিয়ে।এর মধ্যে শেষ দুটো সুরা অর্থাৎ মুআওবিযাতাইন [নামে পরিচিত ফালাক ও নাস] মাদানি এবং অবশিষ্ট সবগুলো সুরা মাক্কি।

এছাড়া, প্রতিটি অধ্যায়ের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু থাকে এবং সে অধ্যায়ের সুরাগুলো ঐ বিষয়বস্তুর আলোকে সাজানো।

প্রথম অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু: ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিকট সত্যকে সুস্পষ্ট করে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা তথা ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন করা এবং এই দুটো উম্মতের জায়গায় বনি ইসমাইল হতে নতুন উম্মতের ভিত প্রতিষ্ঠা।নতুন উম্মতের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি এবং এই উম্মতের সাথে সম্পন্ন হওয়া খোদা তায়ালার শেষ চুক্তিনামার বিবরণ তুলে ধরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু: আরবের মুশরিকদের নিকট সত্যকে সুস্পষ্ট করে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা তথা ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন করা, মুসলিমদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির [সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়] এবং দুনিয়ার বুকে শেষবারের মতো হওয়া খোদায়ি আদালতের বিবরণ।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু একই এবং তা হচ্ছে: হুশিয়ারি বা সাবধানী বার্তা দেয়া এবং পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির [সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি] তুলে ধরা।

সপ্তম ও শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু: কুরাইশ নেতাদেরকে কিয়ামতের হুশিয়ারি শোনানো, তাদের উপর ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন করা এবং ইতমামে হুজ্জাতের ফলস্বরূপ তাদেরকে আযাবের ধমক দেয়া এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য গোটা আরব ভূখণ্ডে সত্যের বিজয় লাভের সুসংবাদ প্রদান। এই অধ্যায়কে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে হুশিয়ারি ও সুসংবাদ প্রদানের অধ্যায়ও বলতে পারি।

সাতটি অধ্যায় থেকে প্রথম অধ্যায়কে আলাদা করলে কুরআনের বিন্যাস-ধারা হবে শেষ থেকে শুরুর দিকে।সপ্তম অধ্যায়টি এজন্যই হুশিয়ারি ও সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। অতঃপর, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় অধ্যায়ে হুশিয়ারি ও সুসংবাদ দেয়ার পাশাপাশি সেখানে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির ন্যায় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।সবশেষে আসে দ্বিতীয় অধ্যায়, যা [সপ্তম থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত] চলমান বিন্যাসের সর্বশেষ নমুনা এবং এই অধ্যায়ে এসেই নবীর প্রচারিত হুশিয়ারি তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ঠিক এ কারণেই এই অধ্যায়ে ইতমামে হুজ্জাত, [মুসলিমদের] পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার সাথে সাথে [কুরআন তার নিজ] শ্রোতাদের জন্য আসমানি আদালত থেকে জারিকৃত ফয়সালার বিষয়টিও সামনে নিয়ে এসেছে – যেটাকে আমরা কিয়ামতের পূর্বে আযাব ও পুরস্কার প্রদানের সর্বশেষ খোদায়ি মঞ্চ হিসেবে আখ্যায়িত করি।

এই দিক থেকে প্রথম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ আলাদা এবং এখানে শ্রোতা হিসেবে আরবের মুশরিকদের পরিবর্তে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের শুরু থেকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, ইতমামে হুজ্জাত, [মুসলিমদের] পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার পর খোদায়ি আদালত বসার বিষয়টি যেভাবে সুরা তওবাতে সংযোজিত হয়েছে, এই অধ্যায়টিতেও ঠিক তাই হয়েছে। যেভাবে উপরের অধ্যায়গুলো শেষ থেকে শুরুর দিকে অগ্রসর হয়ে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সজ্জিত হয়েছে, [ঠিক তেমনি এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উপর থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হয়ে ঊর্ধ্বক্রম বজায় রেখে সজ্জিত হয়েছে]। বস্তুত, দ্বিতীয় অধ্যায়টি [পাহাড়ের] শীর্ষবিন্দু বা চূড়ার ন্যায়, যেখানে উভয় দিক থেকে একই ধরনের বিষয়বস্তু সামনে এগুতে থাকে এবং এভাবে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিয়ে স্থির হয়, তবে পার্থক্য হচ্ছে: উভয়ক্ষেত্রে শ্রোতামণ্ডলী ভিন্ন-ভিন্ন।

এখান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অগ্রগামী অধ্যায়গুলোকে নিম্নক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে, যেন এই বিন্যাসটি প্রথম অধ্যায়ের সাথে আবশ্যক সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

প্রথম অধ্যায়কে সবার আগে এজন্য স্থান দেয়া হয়েছে যে, কুরআনের বাহকগণই [এখন] এর প্রধান শ্রোতা। প্রথম অধ্যায় বাদ দিলে, [প্রতিটি অধ্যায়ের] মাক্কি সুরাগুলোতে সাধারণভাবে হুশিয়ারি বার্তা, সুসংবাদ প্রদান ও ইতমামে হুজ্জাতের বিষয় আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে মাদানি সুরাগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে [মুসলিমদের] পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। এছাড়া প্রতিটি অধ্যায়ে মাক্কি ও মাদানি সুরাগুলো এমন নিখুঁত উপায়ে নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য ও সংহতি বজায় রেখেছে, যা দেখলে মনে হবে গাছের মূল থেকে কাণ্ড বের হচ্ছে এবং কাণ্ড থেকে শাখা ফুটছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দুনিয়াতে প্রেরণের ফলস্বরূপ আরব ভূখণ্ডে খোদার যে আদালত বসেছিল, তার বিবরণ এমন চৎমকার ও নান্দনিক বিন্যাসের সাথে এই গ্রন্থে চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।এই দিক থেকে দেখলে, ধর্ম যে মৌলিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে, সেটাকে কুরআন চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে [এবং চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে], খোদার আদালত একদিন পুরো দুনিয়ার জন্য ঠিক এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

[চলবে]

মিজান
মুকাদ্দিমা ১: মূলনীতি

জাভেদ আহমেদ গামিদি

দ্বীন আল্লাহতায়ালার হেদায়েত, যা তিনি সর্বাগ্রে মানুষের ফিতরাতে সঞ্চারিত করেছেন বা ঢেলে দিয়েছেন। এরপর তিনি এই দ্বীনের যাবতীয় জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ স্বীয় নবীগণের মাধ্যমে মানবজাতিকে দিয়েছেন। নবী প্রেরণের এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ হলেন: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। ঠিক এই কারণে, জমিনের বুকে দ্বীনের একমাত্র উৎস – মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিসত্তা। কেবল তার ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি তার প্রতিপালকের হেদায়েত লাভে সক্ষম হবে। কেবল তার ব্যক্তিসত্তার জন্য এ অধিকার সংরক্ষিত যে, নিজের কথা-কাজ এবং মৌনসম্মতি-অনুমোদনের মাধ্যমে যে জিনিসগুলোকে তিনি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেগুলোই দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত সত্য দ্বীন হিসেবে বিবেচিত হবে:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (الجمعہ ۶۲: ۲)

“তিনিই উম্মিদের মধ্য থেকে রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতগুলো তাদেরকে পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, আর এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য

তাদেরকে তিনি কানুন ও হিকমতের শিক্ষা দেন।” (সুরা জুমুআ, ৬২:২)

এই কানুন ও হিকমত-কেই সত্য দ্বীন “ইসলাম” হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।ইসলামের উৎসের বিবরণ সম্পর্কে আমরা বলি: আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এই দ্বীন তার সাহাবিগণের ইজমা এবং মৌখিক ও ব্যবহারিক তাওয়াতুরের মাধ্যমে আমাদের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সেটা দু’ভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে:

- ১. কুরআন মাজিদ
- ২. সুন্নাত

কুরআন মাজিদের ব্যাপারে প্রত্যেকটি মুসলিম এই হাকিকত সম্পর্কে অবগত যে, আল্লাহতায়ালা এই গ্রন্থটি তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নাযিল করেছেন।কুরআন নাযিলের পর আজ পর্যন্ত তা মুসলিমদের নিকট মজুদ রয়েছে এবং মজুদ হওয়ার বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট যে [এটা অনায়াসে বলে দেয়া যায়] – মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যে গ্রন্থটি নাযিল হয়েছে, এটাই সে গ্রন্থ।[অতঃপর রাসুলের ইন্তেকাল হলে] তার সাহাবিগণ ইজমা ও মৌখিক তাওয়াতুরের মাধ্যমে সামান্যতম পরিবর্তন ও পরিমার্জন ছাড়াই গোটা দুনিয়ার নিকট কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন।

সুন্নাত দ্বারা আমরা দ্বীনে ইব্রাহিমির ঐ সকল প্রথা ও রেওয়াজকে বুঝাচ্ছি, যেগুলোকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরুজ্জীবিত করেছেন, সংস্কার করেছেন এবং সেগুলোতে কিছু পরিবর্ধন এনে তার অনুসারীদের জন্য দ্বীন হিসেবে জারী করেছেন। কুরআন নবীজিকে মিল্লাতে ইব্রাহিম অনুসরণের আদেশ দিয়েছে।আর এ সমস্ত প্রথা ও রেওয়াজ ইব্রাহিমি ধর্মেরই অংশ।এই সম্পর্কে বলা হয়েছে:

ثُمَّ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ اَنِ اتَّبِعۡ مِلَّۃَ اِبۡرٰهِیۡمَ حَنِیۡفًا ؕ وَ مَا کَانَ مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ۔(النحل١٦: ١٢٣)

“আর (এই কারণে) আমরা আপনাকে এই মর্মে ওহি বা প্রত্যাদেশ করেছি যে, আপনি ইব্রাহিমের এই পথের অনুসরণ করুন, যিনি ছিলেন পুরোপুরি একনিষ্ঠ এবং যিনি মুশরিকদের কেউ ছিলেন না।” (সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৩)

সুন্নাতের মাধ্যমে দ্বীন হিসেবে আমরা যা পেয়েছি, তা নিম্নরূপ:

ইবাদত –

- ১. নামাজ।
- ২. যাকাত ও সদকায়ে ফিতর।
- ৩. রোজা ও ইতিকাফ।
- ৪. হজ্জ ও উমরা।
- ৫. কুরবানি এবং আইয়ামে তাশরিকের তাকবির।

সামাজিক বিধি-বিধান –

- ১. বিবাহ ও তালাক এবং এ দুটোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি।
- ২. মাসিক ও প্রসব পরবর্তী ঋতুকালে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকা।

পানাহার –

- ১. শুকর, রক্ত, মৃত পশু এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো নামে জবাই করা পশুর মাংস খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।
- ২. নিজেদের এবং পশুর মধ্যকার 'অপবিত্রতা' দূরীকরণের জন্য আল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা।

সামাজিক রীতিনীতি ও শিষ্টাচার –

- ১. আল্লাহর নাম নিয়ে পানাহার শুরু করা এবং তা ডান হাত দিয়ে সম্পন্ন করা।
- ২. সাক্ষাতের সময় (আস-সালামু আলাইকুম) বলা ও তার জবাব দেয়া।
- ৩. হাঁচি দেয়ার পর (আল-হামদু) বলা এবং তার জবাবে বলা (ইয়ারহামু-কাল্লাহু)।
- ৪. গোঁফ বা মোচ ছোট রাখা।
- ৫. নাভীর নিচের পশম কাটা।
- ৬. বগলের পশম পরিষ্কার করা।
- ৭. বড় হওয়া নখ কেটে ফেলা।
- ৮. পুরুষদের খতনা করা।
- ৯. নাক, মুখ এবং দাঁতের পরিচ্ছন্নতা।
- ১০. ইসতিনজা [প্রসাব-পায়খানার পর পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা]।
- ১১. মাসিক ও প্রসব পরবর্তী ঋতুর পর গোসল করা।
- ১২. জানাবাতের গোসল [বীর্যপাত ও যৌন মিলনের পর গোসল করা]।
- ১৩. মৃতের গোসল দেয়া।
- ১৪. মৃতের দাফন-কাফনের বন্দোবস্ত করা।

- ১৫. লাশ দাফন করা।
- ১৬. ঈদুল ফিতর।
- ১৭. ঈদুল আযহা।

এগুলোই সুন্নাত এবং এগুলোর ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় যে, প্রামাণিকতার দিক থেকে কুরআন মাজিদ এবং সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন মাজিদ আমরা যেভাবে সাহাবিগণের ইজমা ও মৌখিক তাওয়াতুরের মাধ্যমে পেয়েছি, ঠিক তেমনি সুন্নাতও আমরা ইজমা এবং ব্যবহারিক তাওয়াতুরের মাধ্যমে পেয়েছি। কুরআন মাজিদের ন্যায় সুন্নাতও প্রতিটি যুগের মুসলিমদের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।তাই সুন্নাতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের কোনো সুযোগ নেই।

কোনো সন্দেহ ছাড়াই দ্বীন এই দুটো উৎসের মাঝেই নিহিত।এর বাহিরে কিছুই দ্বীন নয়, আর না সেগুলোকে দ্বীন বানানো যেতে পারে।রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা-কাজ এবং মৌনসম্মতি-অনুমোদনের বিবরণ সম্বলিত আখবারে আহাদ, যা সাধারণত "হাদিস" নামে পরিচিত, সে ব্যাপারে এই বাস্তবতা অনস্বীকার্য যে, হাদিসের প্রচার ও সংরক্ষণে নবী নিজের তরফ থেকে কখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেননি, বরং তিনি বিষয়টি শ্রোতা ও প্রত্যক্ষদর্শীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন – ইচ্ছে হলে [অন্যের কাছে] পৌঁছাবে অথবা পৌঁছাবে না।এই কারণে হাদিসের ভিত্তিতে দ্বীনের মধ্যে কোনো বিশ্বাস ও কর্মের সংযোজন হয় না।বরং দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছুর বিবরণ হাদিসে পেশ করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনে ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এই দ্বীন অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে নবীজির দেখানো উসওয়ায়ে হাসানা তথা উত্তম আদর্শের বিবরণ। হাদিসের পরিধি এই বিষয়গুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ।এজন্য এই গণ্ডি বহির্ভূত কিছুই হাদিস হতে পারে না, আর না সেগুলো কেবল হাদিসের নামে বর্ণিত হয়েছে বলেই গ্রহণযোগ্য হবে।

এই সীমার মধ্যে, নিশ্চিতভাবে ঐ ব্যক্তির উপর হাদিসের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে, যিনি কোনো একটি হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন এবং সেটাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা-কাজ এবং মৌনসম্মতি-অনুমোদন হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[এমনটি ঘটলে] ঐ হাদিসের ব্যতিক্রম করা ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না।বরং উক্ত হাদিসে যদি কোনো হুকুম বা সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়, তবে তার সামনে মস্তক অবনত করা ছাড়া বিকল্প নেই।

কুরআন, সুন্নাত ও হাদিস – এই ৩টি বিষয়ই উপলব্ধির ময়দান। এজন্য এগুলোর ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লালনের জন্য আমাদের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো প্রত্যেক জ্ঞানীর নজরে রাখা আবশ্যক, সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরবো।

[চলবে]

নামাজ না পড়লে প্রহার, ইসলাম কী বলে?

হাদিস

আমাদের মুসলিম সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, সন্তানদের ১০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরেও যদি নামাজ আদায় না করে, তবে অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো সন্তানদের প্রহার করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ আদায় না করবে। এর দলিল হিসেবে কিছু হাদিস উদ্ধৃতি করা হয়। এই পর্যায়ে আমরা এই হাদিসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। আসলেই কী ইসলামে শিশুদের নামাজ আদায় না করার অপরাধে প্রহার করতে বলা হয়েছে?

এই মর্মে প্রথম যে হাদিসটি উদ্ধৃতি করা হয় তা নিম্নরূপ:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين،
وفرقوا بينهم في المضاجع۔

আমর বিন শুয়াইব থেকে, তার পিতার সূত্রে, তার দাদার সূত্রে, তিনি বলেন "আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও যখন তারা ৭ বছর বয়সে পৌঁছায় এবং ১০ বছর বয়সে নামাজ না পড়ার জন্য তাদের প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।" (আবু দাউদ)

প্রথমে আমরা উল্লিখিত হাদিসটির সনদ যাচাই করে দেখব এটা সহিহ কিনা। এই হাদিসটি সম্পর্কে আমরা যাচাই করে দেখেছি যে, গোটা হাদিসশাস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র ২ জন সাহাবি এটা বর্ণনা করেছেন।তারা হলেন: সাবরাহ বিন মাবাদ আল-জুহনি (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)।

প্রথম সাহাবি সাবরাহ বিন মাবাদ আল-জুহনি (রা.) থেকে এই বিষয়ে যত বর্ণনা রয়েছে, তার সবগুলো মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল হিসেবে বিবেচিত।এসব বর্ণনা দুর্বল হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, এই হাদিসের সনদে বর্ণনাকারী হিসেবে আব্দুল মালিক ইবনুর-রাবি আল জুহানী উপস্থিত রয়েছেন।রিজাল শাস্ত্রে তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

إسناد ضعيف، فيه عبد الملك بن الربيع الجهني وهو ضعيف الحديث۔

“আব্দুল মালিক ইবনুর-রাবি আল জুহানি বর্ণনাকারীদের মাঝে থাকলে তা দুর্বল সনদ এবং তিনি হাদিসে দুর্বল।” (মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিজি প্রভৃতি গ্রন্থে এমন বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে)।

দ্বিতীয় সাহাবি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)।আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর মারফতে বর্ণিত এই হাদিসটি প্রথমে ইমাম মালিকের ‘আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়।হাদিসটি হলো:

وقال مالك: تؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا. قال سحنون، عن ابن وهب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسبرة الجهني أن رسول الله ﷺ قال: ”مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

মালেক বলেন “বাচ্চাদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও যখন তাদের দুধের দাঁত পরে যায়।” সাহনুন ইবনে ওহাব, আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল আস থেকে এবং তিনি সাবরাহ আল-জুহনি থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স ৭ বছর হয়, তারপর তাদেরকে নামাজ পড়তে আদেশ করো এবং যখন তারা ১০ বছর বয়সে পৌঁছাবে তখন যদি তারা নামাজ না পড়ে, তবে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।” (আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/১৩২)

এই বর্ণনায় উভয় সাহাবির নাম একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত উপরে উল্লিখিত হাদিস দুইটি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই হাদিসের সমস্যা হলো: এর একজন বর্ণনাকারী রাবি 'ইবনে ওহাব', যার জন্মতারিখ ১২৫ হিজরি। অথচ তিনি যে সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করছেন তারা উভয়েই ২৫ হিজরির আগে ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং এই হাদিসের সনদ বিচ্ছিন্ন, তাই এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণে ইমাম মালেক এই বর্ণনাকে তার প্রধান গ্রন্থ মুওয়াত্তায় উল্লেখ করেননি।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-আস (রা.)-এর মারফতে সরাসরি যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তা প্রথমে 'মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। মুসান্নাফে উল্লিখিত রয়েছে:

عن داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال نبي الله ﷺ:
"مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع"

দাউদ বিন সুওয়ারের সূত্রে, আমর বিন শুয়াইবের সূত্রে, তার পিতার সূত্রে, তার দাদার সূত্রে, তিনি বলেন "আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আপনার সন্তানদের ৭ বছর বয়সে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন এবং ১০ বছর বয়সে নামাজ না করার জন্য তাদের প্রহার করুন এবং তাদের বিছানায় আলাদা করে দেন।' (মুসান্নাফ, ৩৩৯৪)

প্রকৃতপক্ষে এই একই হাদিস পরবর্তী হাদিস গ্রন্থগুলোতে গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমনকি অনেক আলেম এটাকে 'হাসান-লিগাইরিহি' মর্যাদায়ও ভূষিত করেছেন। আর এভাবে বর্ণনাটি গ্রহণ করায় এটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সঠিক বর্ণনা হিসেবে বিবেচিত হয়।এই হাদিস সম্পর্কে আলেমদের রায় হলো:

إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا سوار بن داود المزني.

"এর সনদ মুতাবিয়াত (অনুসৃত সূত্র) ও শাওয়াহিদ (সহায়ক সূত্র) অনুযায়ী হাসান। বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী তবে সিওয়ার বিন দাউদ আল-মুজানি ছাড়া।

আমাদের গবেষণামতে কেউ যদি এই হাদিসের সনদগুলোর দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে, তাহলে এর মধ্যে সমস্যা দেখতে পাবে।নিচে তা তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: এই হাদিসগুলোর সনদে বর্ণনাকারী হিসেবে সাওয়ার বিন দাউদ উপস্থিত রয়েছেন। তার সম্পর্কে আমাদের রিজাল শাস্ত্রবিদদের মতামত হলো: তার মারফতে বর্ণিত হাদিসগুলো দুর্বল।যেমন, হাফিজ যাহাবি (রহ.) তাকে দুর্বল বলেছেন।জারাহ ও তাদিলশাস্ত্র তথা বর্ণনাকারীদের সমালোচনা শাস্ত্রবিদগণ এই হাদিসের সনদের বিদ্যমান বর্ণানাকারী 'সাওয়ার বিন দাউদ' সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। হাফিজ যাহাবি তাকে দুর্বল বলে মনে করেন। একইভাবে 'তাকরিব আত-তাহযিব' গ্রন্থের লেখকের অভিমত হলো ইবনে সাওয়ার নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি বলেন:

ضعيف يعتبر به ، ولم يحسن الرأي فيه سوى أحمد

"তাকে দুর্বল বলে মনে করা হয় এবং শুধুমাত্র আহমদ তার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন।"

অতএব, এই বর্ণনার ভিত্তিতে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের মারফতে বর্ণিত বর্ণনাকে দুর্বল বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই কারণে অনেক সমসাময়িক আলেম এই হাদিসকে এর সনদের প্রেক্ষিতে সহিহ মনে করেন না।

দ্বিতীয়ত: যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, তা হলো আমর বিন শুয়াইব কী তার দাদার কথা পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করছেন নাকী তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করছেন, এই বিষয়ে কোনো নিশ্চিয়তা পাওয়া যায় না। অতএব, যদি আগেরটা হয় তবে বর্ণনাটি সহিহ হবে এবং যদি পরেরটা হয় তবে সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকবে।

তৃতীয়ত: ইবনে আবি শায়বা (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থ মুসান্নাফে এই বর্ণনাটি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেখানে ইবনে আবি শায়বাহ এটাকে তাবেয়ির বক্তব্য হিসেবে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। এটা থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এই বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে কোনো হাদিসই নয়, বরং এটা একজন তাবেয়ির বক্তব্য।এই মর্মে বর্ণনাকারীর বক্তব্য হিসেবে উল্লিখিত রয়েছে:

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي رجاء، عن مكحول، قال: يؤمر الصبي بها إذا بلغ السبع ويضرب عليها إذا بلغ عشرا

ওয়াকি বর্ণনা করেন, সুফিয়ান থেকে শুনেছেন, তিনি আবি রাজা থেকে এবং তিনি মাকহুল থেকে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "যখন আপনার সন্তানের বয়স ৭ বছর হবে,

তখন তাদের নামায পড়ার নির্দেশ দেন এবং যখন তারা ১০ বছর বয়সে পৌঁছাবে, তখন প্রহার করুন যদি তারা নামায না পড়ে।' (মুসান্নাফ আবি শায়বা, ৩৪০২)

তাই মারফু বর্ণনায় সনদের দুর্বলতা ও পূর্বোক্ত ত্রুটি উভয়ের ভিত্তিতে এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই বর্ণনাটি সাহাবির বক্তব্য অথবা তাবিযির গবেষণা ছিলো, যা পর্যায়ক্রমে হাদিসের মতো করে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে বাযযারের একটি বর্ণনা দ্বারা এটা আরও নিশ্চিত হয়।

হাদিসের মহান পণ্ডিত ইমাম শওকানি তার নায়লুল আওতারে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, অন্য একটি বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় এই বর্ণনাটি একটা কাগজের টুকরোতে লেখা অবস্থায় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে পাওয়া যায় এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সম্বন্ধিত ছিলো না। বরং এটা ছিল এমন ব্যক্তির কথা, যার পরিচয় জানা যায়নি, যিনি বলেছিলেন শিশুকে ৯ বছর বয়সে নামাজ না পড়ার জন্য আঘাত করা যাবে। বর্ণনায় লেখা আছে:
আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাফি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসুল (সা)-এর ইন্তেকালের পর আমরা একটি তরবারির কাছে লিখিত কাগজ পেলাম। যার উপর লেখা ছিল: 'আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু। ভাই-বোনদের বিছানা আলাদা করো, যখন তারা ৭ বছর বয়সী হবে এবং আমি মনে করি ৯ বছর বয়সে নামাজ না পড়ার জন্য তাদের প্রহার করতে পারো।'

সারসংক্ষেপ

এই হাদিসের ভিত্তিতে কিছু আলেম শিক্ষার্থীদের মারধর করাকে বৈধ মনে করেন। তবে আমাদের মতামত হলো, এই বর্ণনাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে এসেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এটা দুর্বল। এই কারণেই ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এই বর্ণনা তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। অধিকন্তু, এই বর্ণনার সনদের অসঙ্গতির আলোকে এই বর্ণনাকে প্রতিষ্ঠিত যুক্তি, বিবেক ও ইসলামের সম্মিলিত বাণীর বিরোধী মনে হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই কেবল নামাজ পড়তে বাধ্য, সেহেতু একটি শিশু যখন নামাজ পড়তে বাধ্য নয়, তাই তাকে নামাজ না পড়ার জন্য শাস্তি দেয়ার সুযোগ নেই।

মনোবিজ্ঞানীদের মতামত হলো, শৈশবকালে এই ধরনের কঠোরতা একজন ব্যক্তির আবেগ ও ধর্মের সাথে তার সংযোগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন উদারমনা ব্যক্তি, যিনি সারাজীবন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন স্নিগ্ধতা, ভদ্রতা ও যুক্তি সহকারে। এমন একজন মানুষ কীভাবে হঠাৎ এই দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, যার ফলস্বরূপ পিটাপিটি, মানসিক চাপ দিয়ে নামাজের মতো একটি পবিত্র কাজকে শারিরীকভাবে জোর করে করানোর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে?

আদর্শ হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জ্ঞান ও কর্ম

(হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আসার)

ড. আম্মার খান নাসির

[এই অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিছু নির্বাচিত আসারের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার মূল বিষয় হলো: দ্বীন-ধর্মে সাহাবিগণের অনুসরণীয় হওয়া এবং তাদের জ্ঞান ও কর্মে আদর্শ হিসেবে উম্মাহর জন্য পথপ্রদর্শক হওয়া। ইবনে মাসউদ (রা.) প্রাথমিক যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবি এবং সাহাবিগণের মধ্যে অন্যতম ফকিহ। সাইয়িদুনা উমর (রা.) তার জ্ঞান ও ফিকহের প্রশংসা এভাবে করেছেন: 'কানিফুন মালিউন ইলমান' (তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, নম্বর: ২৩১১), অর্থাৎ একটি ছোট থলে, যা জ্ঞানে পূর্ণ।সাইয়িদুনা উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময়ে মুসলিমদের শিক্ষা এবং দ্বীনি পথনির্দেশনার জন্য তাকে কুফায় পাঠানো হয় এবং সাইয়িদুনা উসমান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম কয়েক বছর তিনি সেখানেই ছিলেন। তারপর তাকে মদিনায় ফেরত ডাকা হয়, যেখানে ৩২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।কুফা ছিল এমন এক স্থান, যেখানে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন ধারা আবির্ভূত হচ্ছিল এবং যেখানে সাহাবিদের সম্মিলিত ধর্মীয় বোঝাপড়া ও কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুতির লক্ষণ দৃশ্যমান ছিল। এই প্রেক্ষাপটে সাহাবিগণের অনুসরণ ও তাদের পথনির্দেশের গুরুত্ব তুলে ধরা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শিক্ষা ও প্রচারের একটি প্রধান বিষয় ছিল। উপস্থাপিত আসারগুলো থেকে এই বিষয়টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়।]

(১)

عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: إِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ سَيِّئٌ۔

“যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন: আল্লাহতায়ালা বান্দাদের হৃদয়ের অবস্থা পরখ করেছেন, তারপর মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়কে বান্দাদের হৃদয়ের মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে পেয়ে তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তারপর মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ের পর বান্দাদের হৃদয়ের অবস্থা আবার পরখ করেন এবং তার সাহাবিদের হৃদয়কে বান্দাদের হৃদয়ের মধ্যে সেরা হিসেবে পেয়ে তাদেরকে তার নবীর সাহায্যকারী নিযুক্ত করেন, যারা তার ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেন। অতএব, মুমিনগণ (অর্থাৎ সাহাবিগণ) যেটা ভালো মনে করেন, তা আল্লাহর কাছে ভালো এবং যেটা তারা খারাপ মনে করেন, তা আল্লাহর কাছে খারাপ।” (মুসনাদে আহমাদ: ৩৪৬৮)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

১. মৌলিক বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই আসারটি নবী (সা.)-এর এই বিখ্যাত বাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا – “আল্লাহতায়ালা আমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং আমার সাথে আমার সাহাবিদেরও নির্বাচিত করেছেন।” (মুস্তাদরাক হাকিম, ৬৭৩২)

এই আসার থেকে স্পষ্ট যে, নবীদের ও তাদের সাথি ও সহযোগীদেরকে তাদের হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ তাকওয়া, সত্যপ্রেম ও সততার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়।

২. শেষোক্ত বাক্য থেকে স্পষ্ট যে, এর পটভূমি ছিল: সাহাবিগণের কিছু সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে যে সন্দেহ ও সংশয় ছিল, তা দূর করা। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখে তাঁর নবী (সা.)-এর সহায়তার জন্য নির্বাচিত করেছেন, তাদের ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহর কাছে বিশ্বাসযোগ্য এবং তাদের করা সিদ্ধান্তসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী হতে পারে না।

যদি এই গোষ্ঠী কোনো সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা বা তা নিয়ে নিন্দা ও আপত্তি তোলা ধর্মীয়ভাবে সঠিক নয়। আসারের বর্ণনাকারী আবু বাকর ইবনে আয়াশের যে মন্তব্য উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকেও একই বিষয় স্পষ্ট হয়।

৩. এই আসারের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট যে, এখানে বিশেষভাবে সাহাবিদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে। ফকিহদের মধ্যে অনেকেই এই আসারের শেষ বাক্য مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (মুসলিমরা যা ভালো মনে করবে, তা আল্লাহর কাছে ভালো হবে) থেকে ফিকহি বিষয়গুলিতে প্রথা বা ঐতিহ্যের গুরুত্বকে প্রমাণের জন্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন (কুদুরি, তাজরিদ, ৬/৩০৩৫; বদরুদ্দিন আইনি আল-হানাফির আল-বিনায়াহ শারহ আল-হিদায়াহ, ১০/২৭৬)

প্রথার গ্রহণযোগ্যতা একটি ফিকহি নিয়ম হিসেবে তার জায়গায় সঠিক হতে পারে, তবে এখানে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্দেশ্য কোনো ফিকহি নিয়মের ব্যাখ্যা করা নয়। একইভাবে এই আসারটি সাধারণ মুসলমানদের গৃহীত অনেক বিদআত (নতুন উদ্ভাবিত ধর্মীয় আচরণ)-এর বৈধ হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয় এবং মনে করা হয় যে, ধর্মীয়ভাবে যেকোন বিষয় যদি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রচলন লাভ করে, তবে সেটা শরিয়ত অনুমোদিত। স্পষ্টত এখান থেকে এই কথা গ্রহণ করা বক্তব্যের উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই নয়।

উৎসগ্রন্থ এবং পৃথক পৃথক সূত্র

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এই আসারটি মুসনাদে আহমাদ ছাড়াও নিম্নলিখিত উৎসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে:

- তাবরানি, المعجم الكبير, নম্বর: ৮৪৯৭।
- المعجم الاوسط, নম্বর: ৩৬৮৬।
- আল-আজুরি, الشريعة, নম্বর: ১১৪৬।
- আহমদ ইবনে হাম্বল, فضائل الصحابة, নম্বর: ৫১৭।
- معجم ابن الاعرابى, নম্বর: ৮৪৩।

এই আসারটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর দুই শিষ্য, যির ইবনে হুবাইশ এবং আবু ওয়াইল শাকিক ইবনে সালমা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের উভয়ের সূত্রে কিছুটা

পার্থক্য রয়েছে। আবু ওয়াইলের বর্ণনায় وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ-এর পরিবর্তে وَانْتَخَبَهُ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى بِعِلْمِهِ শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে, فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ-এর পরিবর্তে دِينِهِ ব্যবহৃত হয়েছে। এক সূত্রে শেষের বাক্যে وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ سَيِّئٌ-এর পরিবর্তে وَمَارَأَوْهُ قَبِيحًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ قَبِيحٌ ব্যবহৃত হয়েছে। (বাইহাকি, মাদখাল ইলা সুনানি কুবরা, নম্বর: ২৫)। আহমাদ ইবনে হাম্বলের ফাযায়েলে সাহাবার বর্ণনাটি এরকম: “নবী (সা.)-এর সাহাবিগণ একমত হয়েছিলেন যে, আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করা হবে।”

তবে অন্যান্য সূত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই কথাটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নয়, বরং হাদিসের বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনে আইয়াশ-এর মন্তব্য ছিল। ইবনুল আরাবির বর্ণনায় বলা হয়েছে: “আমি আবু বকর ইবনে আইয়াশ বলছি, সাহাবিগণ (রা.) রাসুল (সা.)-এর পর খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা.)-কে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।” (মুজামু ইবনিল আরাবি, নম্বর: ৮৪৩)

(২)

عن قتادة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالًا، قَوْمًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ

“কাতাদাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে কেউ কাউকে অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবিদের অনুসরণ করে। এই উম্মতের মধ্যে তাদের অন্তর সবচেয়ে বেশি পূণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, তাদের জ্ঞান ছিল সবচেয়ে গভীর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম কৃত্রিমতা ছিল, তাদের জীবনাচরণ ছিল সবচেয়ে সরল এবং তাদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে ভালো। তারা ছিল এমন দল, যাদের আল্লাহ তাঁর নবীর সঙ্গী হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তাদের মর্যাদা বুঝ এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, কারণ তারা সরল পথেই ছিলেন।” (আল-জামি ফি বায়ানিল ইলমি ওয়া-ফাদলিহি, ইবনু আবদিল বার, নম্বর: ১১১৭)

আভিধানিক বিশ্লেষণ

فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ :فليتأس শব্দটি أسوة থেকে এসেছে, যার মানে হলো একটি আদর্শ বা নমুনা, যা অনুসরণ করা উচিত। تأسى بفلان মানে হলো, কাউকে অনুসরণ করা এবং তার পদ্ধতি বা আদর্শ অনুসরণ করা।

فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ: فليستن শব্দটি سنة থেকে এসেছে, যার মানে হলো কাউকে অনুসরণ করা, তার পদ্ধতি গ্রহণ করা।

أَبَرَّهَا قُلُوبًا: أَبَرّ, بَرٌّ اسمتفضيل থেকে একটি (তুলনামূলক আধিক্যবোধক বিশেষণ) এসেছে, যার অর্থ হলো পূণ্যবান। أبرها قلوبًا-এর মানে হলো, যাদের অন্তর সবচেয়ে বেশি পূণ্যে পরিপূর্ণ।

ব্যাখ্যা

১. এই আসারটির প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট যে, ইবনু মাসউদ (রা.) শ্রোতাদের কাছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বড় সাহাবিদের অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণের গুরুত্ব জানাতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্বের নানা দিক তুলে ধরেছেন:

- প্রথমত: তাদের অন্তর পূণ্য, তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতায় পূর্ণ ছিল।
- দ্বিতীয়ত: তাদের জ্ঞান অনেক গভীর ছিল এবং তারা দ্বীনের মেজাজ ও প্রকৃতি এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানতেন।
- তৃতীয়ত: তাদের মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম দুটোই তার প্রাকৃতিক রূপে ছিল এবং তাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা লৌকিকতা ছিল না।
- চতুর্থত: তারা তাদের চরিত্র ও জীবনাচারে অবিচলতা ও ভারসাম্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন।
- পঞ্চমত: ধর্মীয় অবস্থার দিক থেকে তারা শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন।

এই গুণাবলির কারণে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে নবী (সা.)-এর সঙ্গ ও সাহচর্য লাভের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং এই গুণগুলোর কারণেই তারা এই যোগ্যতা লাভ করেছেন যে, পরবর্তীতে আসা মানুষরা তাদের পথ অনুসরণ ও তাদের মতো জীবনাচার গ্রহণকে হেদায়েত লাভের মাধ্যম মনে করবে।

২. মিশকাতে বর্ণিত সূত্রে আসারটির প্রথম বাক্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে: مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ। তবে যেটা মনে হয়, বর্ণনাকারী এই শব্দগুলো ইবনু মাসউদ (রা.)-

এর আরেকটি বাণী থেকে এই আসারের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেখানে ইবনু মাসউদ (রা.) অনুসরণ করার জন্য মৃত ব্যক্তিদের বেছে নেয়ার ব্যাপারে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন।আবদাহ বিন আবি লুবাবাহ বর্ণনা করেন যে, ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন:

أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلاً دِينَهُ، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ، فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَا مَحَالَةَ فَلْيُقَلِّدِ الْمَيِّتَ، وَيَتْرُكَ الْحَيَّ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔

“সতর্ক থাকো, কোনো ব্যক্তি যেন তার ধর্মকে অপর কোনো ব্যক্তির সাথে এমনভাবে যুক্ত না করে যে, যদি সে ঈমান আনে, তাহলে সেও ঈমান আনবে, আর যদি ঐ ব্যক্তি কুফরি করে, তাহলে সেও কুফরি করবে। যদি কাউকে কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়, তবে তাকে জীবিতদের ছেড়ে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত।কারণ জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে মুক্ত নয়।” (বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, নম্বর: ১৮৭২৪)

এটা একটি আলাদা বিষয় এবং এর উদ্দেশ্য হলো: ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে সতর্ক করা।এদিকে আলোচ্য আসারে ইবনু মাসউদ (রা.) সাহাবিদের অনুসরণ এবং তাদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করছেন।

উৎসগ্রন্থ এবং সূত্রের ভিন্নতা

কাতাদার সনদে ইবনু আবদিল বারের পাশাপাশি খতিব বাগদাদি (তালখিসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম, নম্বর: ৬৬৮) এবং রযিনের সূত্রে মিশকাত গ্রন্থকার (নম্বর: ১৯৩) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর আসারটি বর্ণনা করেছেন।এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে মূল পাঠে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি রয়েছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো: খতিবের বর্ণনায় مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ-এর পরিবর্তে مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এই শব্দগুলি বর্ণিত হয়েছে। মিশকাতে বর্ণিত সূত্রে বাক্যটি এভাবে এসেছে: مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ।

অর্থাৎ “যে কাউকে অনুসরণ করতে চায়, সে তাদের অনুসরণ করুক যারা মারা গেছেন, কারণ জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে মুক্ত নয়।”

খতিব এবং মিশকাতের বর্ণনায় اخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর পরে وَإِقَامَةِ دِينِهِ এই শব্দগুলি অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে।
খতিবের বর্ণনায় وَاتَّبِعُوهُمْ فِي أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلاقِهِمْ وَدِينِهِمْ وسيرهم এই শব্দগুলি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে (তালখিসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম, নম্বর ৬৬৮), অর্থাৎ “যতটুকু সম্ভব, তাদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় আচরণ অনুসরণ করো।”

ইবনু মাসউদ (রা.)-এর পাশাপাশি এই বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) ও হাসান বাসরি (রহ.)-এর বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমরের আসার আবু নুয়াইম কিছু শব্দের পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। যেমন, এতে وَإِقَامَةِ دِينِهِ-এর পরিবর্তে وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلاقِهِمْ وَدِينِهِمْ এবং وَنَقْلِ دِينِهِ-এর পরিবর্তে فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ এই শব্দগুলি এসেছে। (আবু নুয়াইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, নম্বর ১০৯৭)।

হাসান বাসরি (রহ.)-এর বক্তব্য হিসেবে আজুরি ও ইবনু আবদিল বার এটা বর্ণনা করেছেন। এতে শেষ বাক্যটি এভাবে এসেছে: فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَإِنَّهُمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ। অর্থাৎ “তাদের মতো নৈতিকতা এবং তাদের মতো পদ্ধতি গ্রহণ করো, কারণ কাবার প্রভুর শপথ, তারা সঠিক পথেই আছেন।” (আল-আজুরি, আশ-শারিয়া, নম্বর ১৯৮৪; আল-জামি ফি বাইয়ানি ইলমি ওয়া ফাদলিহি, নম্বর ১১১৭)

[চলবে]

ইসলামে জ্ঞান ও যুক্তির মৌলিক নীতিমালা

সৈয়দ মনজুরুল হাসান

ইসলামে আলোচনার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও যুক্তির জন্য দুটি নীতিকে মৌলিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো বুদ্ধি ও বর্ণনার মৌলিক ভিত্তি, যা গ্রহণ করা ছাড়া দ্বীন ও শরিয়তের সঠিক উপলব্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই নীতিগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, ইসলামে কুরআন মাজিদের মর্যাদা হলো মিজান ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)।এর অর্থ হলো, দ্বীন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মানদণ্ড হলো পবিত্র কুরআন।

তাই হাদিস ও আসার, ইতিহাস ও সিরাত, ফিকহ ও তাফসিরের প্রত্যেক মতামত, প্রতিটি বর্ণনা ও সব বক্তব্যকে এর মানদণ্ডে ও কষ্টিপাথরে যাচাই করা হবে।যা কুরআন মঞ্জুর করবে, কেবল সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে।আর যা কুরআন প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে দ্বীন বা তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।
এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য এটা অপরিহার্য যে, হাদিসকে কুরআনের আলোকে বোঝা হবে এবং যদি সেখানে কোনো কিছু কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত হবে না।

‘মিজান’-এ বলা হয়েছে: “... ধর্মে কুরআনের মর্যাদা হলো মিজান (মানদণ্ড) ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)। কুরআন সমস্ত বিষয়ের উপর নজরদারি রাখে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য একে বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি কোনো কিছু কুরআনের বিপরীত হয়, তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত।...

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নবুয়ত ও রিসালতের মর্যাদায় যা কিছু করেছেন, সেই ইতিহাসের চূড়ান্ত উৎসও কুরআন।অতএব, হাদিসের অধিকাংশ বিষয় কুরআনের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত, যেমন একটি বস্তুর শাখা তার মূলের সঙ্গে এবং একটি ব্যাখ্যা তার মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। মূল বক্তব্য না দেখে তার ব্যাখ্যা অনুধাবন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।হাদিস অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত যতগুলো ভুল হয়েছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেগুলোর পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়।রিসালতের সময়ে রজমের ঘটনাবলি, কাব ইবন আশরাফকে হত্যা, কবরে শাস্তি এবং শাফায়াতের বর্ণনা, ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি এই মানুষদের সাথে যুদ্ধ করি’ (বুখারি, হাদিস নং: ২৫, মুসলিম, হাদিস নং: ১২৯) এবং ‘যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করো।’ (বুখারি, হাদিস নং: ৩০১৭) – এই জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হওয়ার একমাত্র কারণ হলো: কুরআনের মধ্যে থাকা মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা হয়নি।” (মিজান, পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৫)

দ্বিতীয়ত, কুরআন মাজিদ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর শব্দ ও শৈলীতে কোনো অস্পষ্টতা, দ্বিধা বা সংশয় নেই।অপ্রচলিত বা অপরিচিত কোনো শব্দ বা শৈলী এতে ব্যবহৃত হয়নি।এটা তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে উপস্থাপন করে, যা জ্ঞানীদের জন্য বোঝার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না। ‘মিজান’-এ বলা হয়েছে:

“কুরআন কেবল আরবিতে নয়, বরং আরবি মুবিনে (প্রাঞ্জল আরবি ভাষায়) অবতীর্ণ হয়েছে।অর্থাৎ এমন একটি ভাষায় যা অত্যন্ত পরিষ্কার, যাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই, যার প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট এবং যার প্রতিটি শৈলী তার শ্রোতাদের জন্য পরিচিত ও সহজবোধ্য।

আল্লাহ বলেন: এটা রুহুল আমিন (জিব্রাইল) নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি অন্যান্য নবীর মতো সতর্ককারী হতে পারেন।এটা অত্যন্ত প্রাঞ্জল আরবি ভাষায়।(সুরা শুআরা: ১৯৩-১৯৫)

এমন একটি কুরআনের রূপে, যা আরবি ভাষায় উপস্থাপিত, যার মধ্যে কোনো প্রকার বক্রতা নেই, যেন তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। (সুরা যুমার: ২৮)

কুরআন সম্পর্কে এটা একটি স্পষ্ট সত্য যে, একে যদি আপনি মেনে নেন, তবে এর অপরিহার্য দাবি হিসেবে এটা মেনে নিতে হবে যে, কুরআনের কোনো শব্দ বা শৈলী তার অর্থের দিক থেকে অস্বাভাবিক বা বিরল হতে পারে না। এটা এমন শব্দ ও শৈলীতে নাজিল হয়েছে, যা তার শ্রোতাদের জন্য সম্পূর্ণ পরিচিত। ভাষার দিক থেকে এর মধ্যে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা নেই, বরং সব দিক থেকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট। অতএব, এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানে এর শব্দের পরিচিত অর্থই বিবেচনায় নিতে হবে। এর বাইরে এর কোনো ব্যাখ্যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" (মিজান, পৃষ্ঠা: ২১-২০)

আমাদের দৃষ্টিতে, প্রচলিত মতবাদ ও চিন্তাধারার অধিকাংশ ভুল বোঝাবুঝির কারণ হলো গবেষণা ও বর্ণনার এই মূলনীতিগুলোর প্রতি উদাসীনতা। ফলস্বরূপ, নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও দ্ব্যর্থহীন কুরআনের আয়াতসমূহকে উপেক্ষা করা হয় এবং সম্ভাব্য প্রমাণিত ও দ্ব্যর্থবোধক হাদিসকে মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

হাদিসগুলোকে কুরআনের আলোকে বোঝার পরিবর্তে, কুরআনকে হাদিসগুলোর আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। আরবি ভাষার পরিচিত শব্দ ও শৈলীর ক্ষেত্রেও এমনটি হয়। সেগুলোকে প্রচলিত অর্থ থেকে সরিয়ে অস্বাভাবিক ও অপরিচিত অর্থ গ্রহণ করা হয়। জ্ঞান ও গবেষণার এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এবং বোধ ও যুক্তি উপস্থাপনের এই উল্টো পদ্ধতির দ্বারা কুরআনের মানদণ্ড ও কষ্ঠিপাথর হওয়ার অবস্থান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ভাষা ও মনের ভাব প্রকাশের স্বীকৃত নীতিগুলো উপেক্ষিত হয় এবং কখনো কখনো এমন একটি মর্ম উদ্ধার করা হয়, যা কোনো কোনো দিক থেকে কুরআন ও হাদিস দুটোরই মূলভাবের বিপরীত।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াত

মুহাম্মদ হাসান ইলিয়াস

নবীদের শিক্ষা ও দীক্ষার ক্ষেত্র তাদের নিজ নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের হেদায়েত সময় ও স্থান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল। এই দাবি বর্তমান যুগের কিছু মানুষের পক্ষ থেকে উঠেছে। তাদের মতে, সকল নবী তাদের নিজ নিজ জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা শুধুমাত্র ঐ জাতির প্রেক্ষাপটে ছিল।

অতএব, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও আরব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তার দাওয়াতও আরবদের পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভাষা ও সংস্কৃতির পটভূমির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। সুতরাং, এই দাওয়াত কেবল আরবদের জন্যই নির্দিষ্ট। উপরন্তু, কুরআন মাজিদ তার বক্তব্যে এই দাওয়াতকে শুধুমাত্র আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তার প্রথম শ্রোতাদের উপর এই দায়িত্ব আরোপ করে না যে, তারা এটা পুরো পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

এর বিপরীতে মুসলিমদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রেরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল এবং কুরআন মাজিদের বার্তা সামগ্রিক, যা সকল যুগ এবং সকল জাতির জন্য প্রযোজ্য। এই নিবন্ধে আমরা কুরআনের আলোকে এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করব।

কুরআন মাজিদের ভাষ্যমতে, নবীরা যে হেদায়েত নিয়ে আসেন, তার মর্মবাণী সবসময় একই, তার বার্তা বিশ্বজনীন ও প্রভাব সামগ্রিক। কোনো নবী নতুন কোনো দাওয়াত নিয়ে আসেন না।আল্লাহতায়ালা বলেছেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

“তিনি তোমাদের জন্য ঐ দ্বীনই নির্ধারিত করেছেন, যার নির্দেশনা তিনি নুহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার কাছে ওহি করেছি। আর যার নির্দেশনা আমি ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকেও দিয়েছিলাম এই বলে যে, তোমরা (নিজেদের জীবনে) এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।যে বিষয়ের প্রতি আপনি এই মুশরিকদের আহ্বান করছেন (যেন তারা এক আল্লাহকে মানে) তা এই মুশরিকদের কাছে অনেক কঠিন লাগছে। আল্লাহ যাকে চান, তাঁর দিকে আসার জন্য বেছে নেন, কিন্তু তাঁর দিকে আসার এই পথ তিনি শুধু তাদেরকেই দেখান, যারা তাঁর অভিমুখী হয়।” (সুরা শুরা, ৪২:১৩)

এখান থেকে পরিষ্কার যে, সকল নবী মৌলিকভাবে এক দ্বীনেরই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। তবে, এই হেদায়েতের প্রস্তাবনা শ্রোতাদের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে।কারণ, যে জাতির মধ্যে নবী প্রেরিত হন, সেই জাতির ইতিহাস, ভাষা, চরিত্র ও আচার-আচরণ ভিন্ন হতে পারে।তেমনি তাদের বিচ্যুতির ধরনও ভিন্ন হতে পারে। তবে নবীর দাওয়াতের বিষয়বস্তু, এই বিশেষ প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও, তার মৌলিকতা ও তাৎপর্যে সমস্ত মানবজাতির জন্য জ্ঞান ও হেদায়েতের মশাল হয়।

বিষয়টি এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহিদের বৈশ্বিক কেন্দ্রকে শিরকের মলিনতা থেকে পবিত্র করেছেন। এই বিচ্যুতির প্রশ্রয়দাতা নিঃসন্দেহে কুরাইশরা ছিল, যারা ঐতিহাসিকভাবে হারামের পুরোহিত ছিল। আরব জাতির একটি ভাষা, সংস্কৃতি ও শিরকের নির্দিষ্ট আচার-আচরণ ছিল। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জাতিকে তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সম্বোধন করেছেন এবং তাদের মিথ্যা বিশ্বাস ও মতবাদগুলোর বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন।

তবে, যে বার্তা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন, তা হলো: এই মূর্তিগুলিকে আল্লাহর অংশীদার বানানো একটি ভ্রষ্টতা ও অপরাধ। নবীর এই দাবি নিঃসন্দেহে সামগ্রিক একটি সত্য, যা কেবল আরবদের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

অতএব, নবীদের শিক্ষা ও দাওয়াতের বিষয়বস্তু মৌলিকভাবে কখনোই স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নবীগণ তাদের নিজ সত্তায় সর্বজনীন বার্তা, বৈশ্বিক সত্য ও সমস্ত মানবজাতির জন্য হেদায়েতের উৎস।

নবী যখন এই হেদায়েত নিয়ে জাতির মধ্যে প্রেরিত হন, তখন তিনি প্রথমে মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে বিদ্যমান সেই ঐশী সচেতনতা উদ্দীপিত করেন, যা প্রতিটি মানুষকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। তবে, কিছু ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি আসে, যেখানে মানুষের প্রকৃতিগত সচেতনতা যথেষ্ট নয় অথবা বিস্তারিত ও বাস্তব প্রয়োগে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে নবী শরিয়ত এবং আইন দিয়ে মানুষের পথপ্রদর্শন করেন।এই আইন তিন ধরনের আদেশে বিভক্ত:

- এক. কারণনির্ভর বিধানাবলি, অর্থাৎ যেগুলি কোনো কারণের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। যখন সেই কারণ থাকবে, তখন আদেশ কার্যকর হবে, আর কারণ অনুপস্থিত থাকলে আদেশের প্রয়োগ হবে না। যেমন, শরিয়তে উত্তরাধিকার-সম্পদের মধ্যে কন্যাদের তুলনায় পুত্রদের দ্বিগুণ অংশ দেয়ার আদেশ রয়েছে। এর কারণ হলো, তাদের সামাজিক ও কর্মগত উপকারিতার মধ্যে পার্থক্য। সুতরাং, যতদিন এই কারণ বজায় থাকবে, ততদিন এই আইন কার্যকর থাকবে। তেমনি, মহিলাদের তালাকবর্তী ইদ্দত পালনের কারণ হলো: গর্ভে সন্তান আছে কিনা, তা নিশ্চিত হওয়া। আবার কিছু আদেশ আছে, যেগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেয়া হয়। যেমন, লেনদেনের ক্ষেত্রে এক পুরুষ এবং দুই মহিলাকে সাক্ষী রাখা।এই আদেশের উদ্দেশ্য হলো: সম্ভাব্য বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা।অতএব, বিবাদের সম্ভাবনা দূর করার জন্য বিকল্প কোনো পন্থা অবলম্বন করলেও শয়িয়তের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।
- দুই. যে বিধানগুলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে এবং যেগুলো আল্লাহর নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল।যেমন, নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি।অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য, উপাসনা এবং নজরানা পেশ করার জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। যেহেতু এটা আল্লাহর দাবি, তাই তিনি তাঁর পছন্দসই পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। যদি মানুষের এই নিয়মগুলি পালন করতে কোনো অসুবিধা হয়, তবে আল্লাহ নিজেই এই নিয়মগুলির মধ্যে শিথিলতার বিধান দিয়েছেন।

- তিন. যে বিধানগুলো কোনো কোনো রাসুলের জাতিকে বিশেষ মিশনের জন্য নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, বনি ইসরাইল এবং বনি ইসমাইল। এই জাতিগুলিকে তাদের বিশেষ মিশনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়েছিল। যেমন, রাসুলের হুজ্জাত বা চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পর যারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ। এই বিধানগুলি সেই জাতিগুলিকে একটি বিশেষ মর্যাদা এবং নির্দিষ্ট মিশনের দাবি পূরণের জন্য দেয়া হয়েছিল।এই ধরনের ধর্মীয় আইনগুলি কুরআন নিজেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছে এবং সেগুলোর নির্দিষ্ট হওয়ার কারণও বর্ণনা করেছে। এই জাতিগুলির বাইরে অন্য কেউ এই আইনগুলির আওতায় পড়ে না, সুতরাং তারা এগুলো পালনের জন্য বাধ্যও নয়।

নবীগণ যে হেদায়েত নিয়ে আসেন, এই হলো তার বিস্তারিত বিবরণ।এখন আমরা এই প্রশ্নে আসি যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হেদায়েত নিয়ে এসেছিলেন, তার দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ তাকে এবং তার জাতিকে কী ধরনের নির্দেশনা দিয়েছিল?

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন আল্লাহতায়ালা বনি ইসমাইলের দিকে প্রেরিত করেন, তখন প্রথমেই যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, তা হলো:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“আপনার গোত্রের লোকদের সতর্ক করুন।” (সুরা শুয়ারা, ২৬:২১৪)

এখানে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোত্রের লোকেরাই বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধয়াক ছিল। এই বিষয়টি আল্লাহতায়ালা অন্য একটি স্থানে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন:

هَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

“এটা এমনই একটি কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, বড়ই বরকতময় এবং এর পূর্বে যা কিছু এসেছিল তাকে সত্যে পরিণত করে, যাতে এর দ্বারা আপনি মানুষকে সুসংবাদ জানাতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় জনপদ ও এর চতুর্পার্শ্বে বসবাসকারী লোকদেরকে এর দ্বারা হুঁশিয়ার করতে পারেন।” (সুরা আনআম, ৬:৯২)

অতএব, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মূল শ্রোতাগণ বনি ইসমাইল ছিল এবং তাকে তাদের কাছে দাওয়াত

পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁদের জন্য আদালত হিসেবে এসেছিলেন, তবে যে বার্তা কুরআন মাজিদের মাধ্যমে তিনি পৌঁছাচ্ছিলেন, তা কি কেবল বনি ইসমাইলের জন্য ছিল? এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

“এই কুরআন আমার কাছে ওহি করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের সতর্ক করি এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছাবে তাদেরকেও।” (সুরা আনয়াম, ৬: ১৯)

অর্থাৎ বনি ইসমাইলের বাইরে যার কাছে এই বার্তা পৌঁছাবে, তার জন্যও এটা হেদায়েত।জাভেদ আহমেদ গামিদি এই আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন:

“এটাই সেই বিষয়, যা সুরা আল-ফুরকানের আয়াত (২৫)-এ এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (যাতে এটা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্কবার্তা হয়)। এখান থেকে স্পষ্ট যে, কুরআন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একটি সতর্কবার্তার উপকরণ। আলেমরা যখন এটার প্রতি দাওয়াত দেবেন, তখন তাদের উচিত নিজ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে এটাকে সতর্কবার্তা হিসেবে উপস্থাপন করা। আল্লাহর পরিচয় ও পরকালের জ্ঞান লাভের জন্য এর চেয়ে বড় কিছু নেই, যা মানুষকে জাগ্রত করতে পারে।” (আল-বায়ান, ২/২০)

এরপর, আল্লাহতায়ালা বনি ইসমাইলকে এই দায়িত্বও প্রদান করেছেন যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা পুরো পৃথিবীজুড়ে পৌঁছে দিতে হবে। এই দায়িত্ব কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহতায়ালা বলেছেন:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী দল বানিয়েছি যেন তোমরা দুনিয়ার সব মানুষের কাছে (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা হও এবং আল্লাহর রাসুল তোমাদের কাছে এই সাক্ষ্য দেন।” (সুরা বাকারা, ২:১৪৩)

জাভেদ আহমেদ গামিদি এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন:

“মূলে এখানে وَسَط শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ولد-এর মতো পুরুষ, মহিলা, একবচন ও বহুবচন সবকিছুর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এর অর্থ ‘মধ্যবর্তী’ এবং এই আয়াতে এটা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জাতি বনি ইসমাইলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুরা হাজ্জ-এর ৭৮-নং আয়াতে هُوَ اجْتَبٰىكُمْ (তিনি তোদেরকে নির্বাচিত করেছেন) এই শব্দগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে দ্বীনের এই সাক্ষ্যের জন্য নির্বাচিত করেছেন, যেমন তিনি আদম সন্তানদের মধ্যে কিছু মহান ব্যক্তিকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য নির্বাচন করেন। এই আয়াতে কুরআন তাদেরকে أُمَّةً وَّسَطًا (মধ্যবর্তী দল) হিসেবে বর্ণনা করেছে, যার মানে: এমন একটি জাতি, যার একদিকে আল্লাহ ও রাসুল এবং অন্যদিকে পৃথিবীর সব জাতি এবং তারা এইসব জাতির কাছে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদিষ্ট। শাহাদাতের অর্থ: সাক্ষ্য দেয়া। যেমন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, ঠিক তেমনি যখন সত্য এই পর্যায়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, তা গ্রহণ না করার কোনো সুযোগ থাকে না, তখন তাকে ‘শাহাদাত’ বলা হয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে তার বিচার প্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করেন এবং তারপর কিয়ামতের আগে একটি ক্ষুদ্র কিয়ামত তাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে স্থাপন করেন। তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকারে স্থির থাকলে এর পুরস্কার এবং বিচ্যুত হলে এর শাস্তি এই পৃথিবীতেই পাবে। ফলে তাদের অস্তিত্ব মানুষের জন্য আল্লাহর একটি নিদর্শন হয়ে ওঠে এবং তারা যেন আল্লাহকে তাদের সাথে পৃথিবীতে চলতে এবং বিচার করতে দেখে। এর সাথে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে সত্য তারা নিজ চোখে দেখেছে, সেই সত্য যেন তারা প্রচার করে এবং আল্লাহর হেদায়েত সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এটা হলো শাহাদাত। যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এটা পৃথিবী ও আখিরাতে আল্লাহর বিচারের ভিত্তি হয়ে ওঠে।” (আল-বায়ান, ১/১৪২-১৪৩)

কুরআন মাজিদ তার প্রথম শ্রোতাদের, অর্থাৎ বনি ইসমাইলকে জাতি হিসেবে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে যে, তারা আল্লাহর বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছাবে যেন সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় এবং আল্লাহর হেদায়েত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহান দায়িত্ব আঞ্জামের সূচনা সাহাবায়ে কিরাম করেছেন, যখন তারা তাদের যুগের ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। কুরআনের প্রথমদিকের সুরাগুলি এই দাওয়াতের ইতিহাস বর্ণনা করে, যা ধীরে ধীরে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাহাবিগণের পর বনি ইসমাঈল তাদের সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ অনুসারে আল্লাহর বার্তাকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছে এবং এই কাজ আজও অব্যাহত আছে। যখন এই দাওয়াত বনি ইসমাইল ছাড়া অন্যদের কাছে পৌঁছায় এবং আমাদের এই বিশ্বাস নিশ্চিত হয় যে, কুরআন ও সুন্নাতের মাধ্যমে এটা সত্যিই আল্লাহর সত্যিকারের হিদায়াত, তখন আমরা এটাকে মেনে নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করি।যেমনি আমরা কুরআন ও সুন্নাতের অধ্যয়ন শুরু করি, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াত ও শরিয়ত আমাদের সামনে সেভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমনটি তা সাহাবিগণ ও প্রাথমিক শ্রোতাদের সামনে ছিল। এভাবে, এই হিদায়াত আমাদের জন্যও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি ছিল বনি ইসমাইলের জন্য, কারণ এই বার্তা কোনো একটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি ব্যক্তি, যিনি এই হেদায়েতকে সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে, সে এই বার্তার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে: যখন আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসলের শ্রোতাদের নামাজের নির্দেশনা দিলেন, তখন বললেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর বন্দেগি করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও যেন তোমরা (তাঁর শাস্তি থেকে) বাঁচতে পারো।” (সুরা বাকারা, ২:২১)

এই আয়াত যদিও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রথম শ্রোতাদের জন্য ছিল, তবে ‘আবদ’ এবং ‘মাবুদ’ এর সম্পর্কের ভিত্তিতে যে ইবাদত প্রয়োজন, তা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর আমাদের জন্যও তেমনই আবশ্যক হয়, কারণ আমরা ‘আবদ’-এর অবস্থানে চলে আসি এবং আমাদের ‘মাবুদ’-এর হেদায়েতের প্রতি বাধ্য হয়ে পড়ি।আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার বন্দেগি করে (এটাই তাদের প্রতি আমার দাবি)।” (সুরা যারিয়াত, ৫১:৫৬)

সুতরাং, ঈমান, আখলাক ও শরিয়তের সেইসব বিধান, যেগুলো বনি ইসমাইলের জন্য মানব হিসেবে আবশ্যক ছিল, আমাদের জন্যও তেমনই আবশ্যক। কারণ আমাদেরও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রকাশ এবং মানবপ্রকৃতির হেদায়েতের বিস্তারিত প্রয়োজন, যেমনটি বনি ইসমাইলের ছিল। আল্লাহর আইন, অর্থাৎ শরিয়তের প্রতি আমরা একইভাবে বাধ্য, যেমনটি তারা ছিল।অর্থাৎ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত সৃষ্টির জন্যই ছিল। কুরআন মাজিদ এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“(হে নবী), আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।(সুরা সাবা: ২৮)

জাভেদ আহমেদ গামিদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন:

“নবী (সা.) সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই কথা বলা হয়েছে যে, অন্যান্য রাসুলদের মতো তিনি শুধু তার জাতির প্রতি প্রেরিত হননি, বরং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। জাতির নেতাদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কারণে আওস ও খাযরাজের মানুষদের দাওয়াত দেন এবং তাদের পর আহলে কিতাব ও আশেপাশের শাসকগণকেও। এরফলে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের সাহায্যের মাধ্যমেই বৈশ্বিকভাবে সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং নবুয়ত ও রিসালাতের পদ চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন এই দাওয়াতের প্রচার সেই উম্মতের দায়িত্ব, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম, সেই আনসারদের তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ি হয়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জাতির লোকদেরকেও আল্লাহ এই সৌভাগ্য দান করেছিলেন যে, পরে তাদের অধিকাংশ ঈমান এনে সেই পদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যে পদকে কুরআনে ‘ইব্রাহিমি বংশের সাক্ষ্যদানের পদ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।” (আল-বায়ান, ৪/১৯৬)

এভাবে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াত এবং নবীদের হেদায়েতের প্রতিটি দিক আমাদের জন্যও তেমনি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যেমনটি প্রথম জাতির জন্য ছিল।সুতরাং, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াত এবং হেদায়েত কোনো একটি জাতি বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, সমস্ত নবী একই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বার্তা পুরো মানবজাতির জন্য।

রোজার উদ্দেশ্য কী?

জাভেদ আহমেদ গামিদি

পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারায় আল্লাহতায়ালা রোজা রাখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ রোজা ফরজ করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো [সুরা বাকারা, ২:১৮৩]।

এই তাকওয়া শব্দটি পবিত্র কুরআনের একটি পরিভাষা। এই পরিভাষাকে যদি আমরা সরলভাবে বর্ণনা করি, তবে এর অর্থ হবে: মানুষ তার জীবন আল্লাহতায়ালার দেয়া সীমানার মধ্যে অতিবাহিত করবে এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে এই উপলব্ধি বজায় রাখবে যে, যদি ভুলবশত কখনো আল্লাহর দেয়া সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর অন্যকোন রক্ষাকর্তা নেই।

রোজা রাখার মাধ্যমে এই তাকওয়া কীভাবে অর্জন করা সম্ভব?

এটা বোঝার জন্য আমরা তিনটি বিষয় এখানে উপস্থাপন করবো।

প্রথমত, আল্লাহর দাস হওয়ার উপলব্ধি:

রোজা একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহতায়ালার দাস হওয়ার উপলব্ধি চূড়ান্তভাবে বদ্ধমূল করে। মূলত আমাদের মানবীয় চাহিদা অর্থাৎ খাদ্য-পানীয় গ্রহণ ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এই উপলব্ধি আমাদের অন্তরে পরিস্ফুটিত হয়।

ফজরের আগ থেকে মাগরিবের আজান পর্যন্ত একজন বান্দা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি তার নফসের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানান। পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে একজন মুমিন

খাদ্য-পানীয় গ্রহণ এবং যৌনমিলন থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে অন্তরে ও কর্মে এই সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আল্লাহর দাস। স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে তিনি আল্লাহর হুকুম অমান্য করছেন না। রোজা আল্লাহর উপর বান্দার বিশ্বাস চূড়ান্ত ও জীবন্ত করে। এভাবেই একজন মানুষের অন্তরে রোজা আল্লাহর দাস হওয়ার উপলব্ধি বদ্ধমূল করে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার ভয়:

রোজার মাধ্যমে দ্বিতীয় যে বিষয়টি একজন মানুষ অর্জন করতে পারে, তা হলো: আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়। সাধারণভাবে একজন মুসলমান আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে জবাবদিহিতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু রোজার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার ভয় প্রকাশ পায় এবং অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি চূড়ান্তভাবে গেঁথে যায়। আল্লাহ বান্দাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, চাইলে সে যখন ইচ্ছে রোজা ভেঙে ফেলতে পারে। প্রচন্ড গরমে পানি পান করতে পারে। নির্জনে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে। কিন্তু একজন রোজাদার আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার ভয়ে নফসের চাহিদাগুলো থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখে। দীর্ঘ এক মাস এই অনুশীলন একজন মুমিনের অন্তরে জবাবদিহীতার ভয়কে পুষ্পের মত ফুটিয়ে তোলে। ফুটন্ত এই পুষ্পের সুঘ্রাণ পরবর্তী দিনগুলোতে তার জীবনে আল্লাহর সঠিক বান্দা হওয়ার বাসনা জাগ্রত রাখে।

তৃতীয়ত, ধৈর্যের অনুশীলন:

আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার ভয় এবং অন্তরে তাকওয়ার উপলব্ধির জন্য জরুরি বিষয় হচ্ছে: ধৈর্যধারণ। রোজা একজন মুমিনকে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেয়।

শুধু কি শিক্ষা দেয়? শুধু শিক্ষা দেয় না, বরং ধৈর্যের অনুশীলনের জন্য রোজা ব্যতীত অন্যকোন মাধ্যম বা এর চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি পৃথিবীতে বর্তমান নেই।

আল্লাহ এই পৃথিবী মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করেছেন। এই পরীক্ষা স্কুল-কলেজের গতানুগতিক পরীক্ষার মত নয়। এটা খোদায়ি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার দুটি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে: আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরি করেছেন। অপরদিকে তিনি ধর্মের মাধ্যমে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। স্বাধীনতা ও আকাঙ্ক্ষার পথ পরিত্যাগ করে আল্লাহর সীমানার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ের ধৈর্যের। রোজা মূলত এই ধৈর্যধারণ করার একটি উত্তম অনুশীলন। পৃথিবীতে রয়েছে অন্যায় এবং মানুষের অন্তর

অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আল্লাহ অন্যায়ের পথে যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহতায়ালার এই হুকুম মানতে হলে ধৈর্যের বিকল্প নেই।রোজা মূলত এই ধৈর্যটাই আমাদের শিক্ষা দেয়।ধৈর্য ব্যতীত কখনোই তাকওয়া অর্জিত হতে পারে না।

রোজার বিধি-বিধান

পূর্ববর্তী নবীদের দ্বীনে রোজার যে বিধান সর্বদা প্রচলিত ছিল, মুসলমানদের সেই বিধান অনুযায়ী আল্লাহ রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, ঈমানদারদের উপর রোজা ঠিক সেভাবে ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল।আরও বলা হয়েছে, এটা কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন, যা এই ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।এই কথা অবশ্য মানুষকে স্বস্তি দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ রোজার বরকত ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করলে বারো মাসের মধ্যে ৩০ বা ২৯ দিন কোনো দীর্ঘ সময় নয়। বরং এটা মাত্র কয়েকটি গণনাযোগ্য দিন, তাই আতঙ্কিত বা মনক্ষুন্ন না হয়ে এই দিনগুলোর পূর্ণ কল্যাণ মানুষের গ্রহণ করা উচিত।

এরপর রোজার শিথিলতার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা অসুস্থতা বা সফরের কারণে রোজা রাখতে পারবে না, তারা অন্য দিনগুলোতে রোজা রেখে এই সংখ্যা পূরণ করবে অথবা এক রোজার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার করিয়ে রোজার কাফফারা আদায় করবে।

এরপর বলা হয়েছে:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“যে স্বেচ্ছায় কোনো সৎকাজ করে, তা তার জন্য আরও উত্তম।আর যদি তোমরা রোজা রাখো, তবে তা তোমাদের জন্য আরও কল্যাণকর, যদি তোমরা বোঝো।” (সুরা বাকারা, ২:১৮৪)

অর্থাৎ ফিদিয়া হলো ন্যূনতম দাবি, যা সামর্থ্যবানদের অবশ্যই আদায় করতে হবে।তবে কেউ যদি একাধিক দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করায় বা তাদের জন্য অন্যকোন সৎকর্ম করে, তাহলে তা আরও কল্যাণকর। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চেয়েও উত্তম কাজ হলো; ফিদিয়া দেয়ার পরিবর্তে অন্য দিনগুলোতে কাজা রোজা আদায় করা।

এরপর আমরা দেখতে পাই পরবর্তী আয়াত شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এখানে ফিদিয়া দেয়ার বিধান বাতিল করা হয়েছে। অতএব পূর্বের বিধান হুবহু পুনরুক্ত করা হয়েছে, তবে এর মধ্যে থেকে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ থেকে إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ পর্যন্ত অংশটি অপসারণ করা হয়েছে।

যেহেতু রমজানের মতই সাধারণ দিনে রোজা রাখা কঠিন, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে উঠেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এটা বাধ্যতামূলক করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে ফিদিয়ার এই অনুমতি বাতিল করা হয়েছে, যেন মানুষ রোজার সংখ্যা পূর্ণ করে এবং এতে লুকিয়ে থাকা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না হয়। এটা রোজার মূল বিধান।

এরপর মানুষের মনে রমজান সম্পর্কে বেশকিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, রমজান মাসের রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবে কিনা? এই প্রশ্ন তৈরি হওয়ার কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, ইহুদিদের রোজা ইফতারের পর পুনরায় শুরু হতো, তারা রোজার রাতে খাদ্য গ্রহণ এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে বৈধ মনে করতো না। মুসলিমরা মনে করেছিল, তাদের জন্যও হয়তো একই বিধান প্রযোজ্য। কিছু মুসলমান এই বিষয়কে বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে এর বিপরীত কাজ করেছিল। বিষয়টি ছিল দৃষ্টিকটু, কারণ যদি কেউ নিজের চিন্তাভাবনা বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনকিছুকে দ্বীন ও শরিয়তের দাবি মনে করে, তবে সেটা শরিয়তের বিধান না হলেও ঐ ব্যক্তির জন্য এই বিধান লংঘন করা বৈধ নয়। কুরআনে এই বিষয়কে নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

“(তোমরা মনে মনে জানতে চাচ্ছো, তাই আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে), রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ রাখা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ দেখলেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছো, তাই তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব এখন (নির্দ্বিধায়) তাদের কাছে যাও এবং (এর ফলাফলস্বরূপ) আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন, সেটার সন্ধান করো। আর খাও ও পান করো, যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের সামনে পুরোপরি ভেসে ওঠে। এরপর রাত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো। তবে মসজিদে ইতেকাফরত থাকলে (রাতের বেলায়ও) স্ত্রীদের কাছে যেও না। এগুলো আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা, তাই তোমরা এগুলোর কাছেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতগুলো বর্ণনা করেন, যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।(সুরা বাকারা, ২:১৮৭)

এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা রোজার যে বিধান জানতে পারি তা নিজে বর্ণনা করা হলো:

শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় রোজা বলা হয়। এই বিধিনিষেধ ফজর থেকে রাতের আগমন পর্যন্ত। সুতরাং, রোজার রাতগুলোতে খাদ্য গ্রহণ এবং স্ত্রীদের কাছে গমন করা সম্পূর্ণ বৈধ।রোজার জন্য রমজান মাসকে নির্ধারিত করা হয়েছে।তাই একজন মুসলিমের জন্য পুরো মাস রোজা রাখা ফরজ। যদি কেউ অসুস্থতা, সফর বা অন্য কোনো কারণে রমজান মাসে রোজা রাখতে না পারে, তবে অন্য দিনগুলোতে রোজা রেখে কাজা আদায় করবে।

ঋতুস্রাব ও প্রসবকালীন অবস্থায় রোজা রাখা নিষেধ। তবে রোজাগুলো পরবর্তী সময়ে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। রোজার পরিপূর্ণতা ও চূড়ান্ত উৎকর্ষ হলো ইতেকাফ। যদি আল্লাহ কারও জন্য ইতেকাফে বসা সহজ করে দেন, তবে তার উচিত রমজানের দিনগুলোতে যতটা সম্ভব দুনিয়াবি ব্যস্ততা ত্যাগ করে মসজিদে অবস্থান নেয়া, শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করা এবং কোনো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

যদি কেউ ইতেকাফে বসে, তাহলে রমজান মাসের রাতে তার জন্য খাদ্য গ্রহণে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে স্ত্রীদের কাছে গমন করা বৈধ নয়।ইতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। রোজার এই বিধান মুসলমানদের সর্বসম্মত ঐক্যমত্য (ইজমা) এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা নিরবচ্ছিন্ন আমল (তথা তাওয়াতুরে আমলি) দ্বারা প্রমাণিত।

এছাড়াও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে রোজার যে বিধান আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. চাঁদ দেখার মাধ্যমে রমজান মাস শুরু হবে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন, "এই মাস ২৯ দিনেরও হতে পারে, সুতরাং চাঁদ দেখলে রোজা শুরু করো এবং চাঁদ দেখলে ইফতার করো।যদি আকাশ পরিষ্কার না থাকে, তাহলে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করো।" (মুসলিম, হাদিস নং ২৫০৩, ২৫১৪)

২. রমজান মাস শুরু হওয়ার এক বা দুই দিন আগে রোজা রাখা উচিত নয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাকে পছন্দ করেননি এবং বলেছেন: "তবে, যে

ব্যক্তি সাধারণত ঐ দিন রোজা রাখে, সে ব্যতিক্রম।” (বুখারি, হাদিস নং ১৯১৪, মুসলিম, হাদিস নং ২৫১৮)।

৩. সাহরি খাওয়ার জন্য উঠা উচিত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “সাহরি খাও, কারণ সাহরি খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।” (বুখারি, হাদিস নং ১৯২৩, মুসলিম, হাদিস নং ২৫৪৯)

৪. রোজা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সব ধরনের ভালোবাসার প্রকাশ বৈধ। মুমিনদের মাতা হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোজা অবস্থায় চুম্বন করতেন এবং আমাকে নিজের কাছে আঁকড়ে ধরতেন। (বুখারি, হাদিস নং ১৯২৭, মুসলিম, হাদিস নং ২৫৭৬)

৫. গোসল ফরজ হলেও ঐ অবস্থায় রোজা রাখা যায়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু কিছু সময় রোজা রাখতেন এবং ফজরের সময় গোসল করতেন। (বুখারি, হাদিস নং ১৯৩১, মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৯)

৬. কেউ যদি ভুলে কিছু খেয়ে ফেলে, এতে তার রোজা ভেঙে যাবে না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “এটা তো আল্লাহই তাকে খেতে এবং পান করিয়েছেন।” (বুখারি, হাদিস নং ১৯৩৩, মুসলিম, হাদিস নং ২৭১৬)

৭. রমজানের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে ইতেকাফ করতে হয় এবং পুরো দশদিনের জন্য ইতিকাফ করা উত্তম।তবে ২৯ দিনে মাস হলে ভিন্ন কথা।হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পদ্ধতিতে ইতেকাফে বসতেন। (বুখারি, হাদিস নং ২০২৫, ২০২৭, মুসলিম, হাদিস নং ২৭৭২, ২৭৮০)।

৮. জেনে বুঝে রোজা ভাঙা মারাত্মক পাপ। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, যদি কেউ এমনটি করে তবে কুরআনে বর্ণিত যাহারের জন্য নির্ধারিত কাফফারা তাকে আদায় করতে হবে।তবে হাদিস থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, এই কাফফারা আদায় করতে কেউ সক্ষম না হলে, তাদের জন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তেমন জোর দেননি (বুখারি, হাদিস নং ১৯৩৬, মুসলিম, হাদিস নং ২৫৯৫)।

গজল

জাভেদ আহমেদ গামিদি

اٹھ کہ یہ سلسلۂ شام و سحر تازہ کریں

উঠ কে ইয়ে সিলসিলায়ে শাম ও স্যাহের তাযা কারেঁ।
ওঠো, প্রভাত-সন্ধ্যার এই পরিক্রমা সচল করো।

عالم نو ہے، ترے قلب و نظر تازہ کریں

আলম নও হে, তেরে কলব ও নযর তাযা কারেঁ।
নয়া জামানা, তোমার হৃদয় ও দৃষ্টিতে নতুনত্ব আনো।

اس زمانے کو بھی دیں اور زمانہ کوئی

ইস যমানে কো ভী দেঁ অওর যমানা কোই।
এই যুগ বদলে দিয়ে আরেক যুগ আনো।

پھر اٹھیں ولولہ علم و ہنر تازہ کریں

ফের উঠেঁ ওয়ালওয়ালায়ে ইলম ও হুনার তাযা কারেঁ।
পুনরায় উঠে শিল্প ও জ্ঞানের প্রেরণা সতেজ করো।

تیری تدبیر سے نومید ہوئی ہے فطرت

তেরি তাদবির সে নওমিদ হুই হে ফিতরাত।
প্রকৃতি আজ আশা হারিয়েছে তোমার কাজে।

راستے اور بھی ہیں، رخت سفر تازہ کریں

রাস্তে অওর ভি হেঁ, রাখতে-সফর তাযা করেঁ।
পথ আরও আছে, সফরের প্রস্তুতি নাও নবউদ্যমে।

شعلہ طور اٹھے آتش فاراں ہو کر

শুলায়ে তূর উঠে আতিশে ফারাঁ হো কার।
তুরের শিখা জ্বলুক মুক্ত অগ্নি হয়ে।

پھر تری خاک میں پوشیدہ شرر تازہ کریں

ফের তেরী খাক মেঁ পোশিদা শরার তাযা কারেঁ।
তোমার মাটিতে লুকিয়ে থাকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালাও ফের।

حرف و آہنگ نہ ہوں سوز دروں سے خالی

হারফ ও আহাঙ্গ না হোঁ সোজ দরোঁ সে খালি।
শব্দ ও সুর হৃদয়ের দহন থেকে শূন্য না হোক।

ہر رگ ساز میں اب خونِ جگر تازہ کریں

হার রগ সায মেঁ আব খুনে জিগার তাযা কারেঁ।
প্রতিটি সুরের তারে হৃদয়ের খুন প্রবাহিত করো।